ড. কে শ্রী ধম্মানন্দ নায়ক মহাথের রচিত

বৌদ্ধ ধর্ম ও মুক্তচিন্তা

শ্রীজ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া অনূদিত

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by B Jyoti Bhante

Buddhism And Free Thinkers
By. Rev. Dr. K. Sri Dhammananda
Nayaka Maha Thero

ড. কে শ্রী ধম্মানন্দ নায়ক মহাথের

রচিত

বৌদ্ধ ধর্ম ও মুক্তচিন্তা

শ্রীজ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া

অনূদিত

সোসাইটি পুস্তিকা-৩৯ Book No. 39

•

Buddhism And Free Thinkers

By Dr. K. Sri Dhammananda

Maha Nayaka Thero

বৌদ্ধ ধর্ম ও মুক্তচিন্তা

ড. কে শ্রী ধম্মানন্দ মহানায়ক থের

রচিত

শ্রী জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া অনূদিত

প্রথম প্রকাশ ঃ পহেলা বৈশাখ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ,
২৫৪৪/১৪-০৪-২০০০ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশক ঃ পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ
প্রযত্নে ঃ নালন্দা,
১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনা সহযোগিতায় ঃ প্রান্তি কম্পিউটারস্।
১৮০, আমিন সোপিং মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১০১৪৭-৯-২২৫

প্রচ্ছদ ঃ সাঁচি স্তুপে বুদ্ধের ধর্ম অভিযানে ধর্মচক্র।

বিনিময়ঃ সাত টাকা

উৎসর্গ

অখিল ভারত ভিক্ষু সংঘের সংঘনায়ক
ত্রিপিটক বাগ্মীশ্বর শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাথের

অখিল ভারত ভিক্ষু সংঘের সংঘনায়ক ত্রিপিটক বাগ্মীশ্বর শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাথের (১৯০৮-'৯৯)

সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরর জন্ম জনপদ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক নৈসর্গ চট্টগ্রামের রাউজান থানাস্থ পশ্চিম আধারমানিক গ্রামে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। গৃহী নাম যতীন্দ্র লাল বড়ুয়া। পিতা চরপ্রু বড়ুয়া, মাতা দময়ন্তী বড়ুয়া। মানিক সদৃশ যতীন্দকে ক্ষুদ্র আধারে (আধারমানিক) বন্দী করা রাখা য়ায়নি তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী দোহের কারেণ। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেও নিজেকে রক্ষা করেন ভিন্ন বলয়ে-চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে পরম পুরুষ অগ্‌গমহাপণ্ডিত ধর্ম্মবংশ মহাস্থবিরের অন্তবাসীরূপে ১৯৩০ খৃষ্ঠাব্দে। শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলিকাতার হাতছানিতে তিনি পুণরায় প্রব্রজ্যিত হন বিণয়াচার্য্য শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরের নিকট ১৯৩১খৃঃ। পরবর্তী বছরে ১৯৩২ খৃঃ আকিয়াবে পণ্ডিত প্রবর জাগ্‌গুম সেয়াদ-এর নিকট উপসম্পদা গ্রহণ এবং পরবর্তীতে ইতালীয় পণ্ডিত ভিক্ষু উ লোকনাথ-এর অনুগামী হয়ে ভারতবর্ষের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ধর্ম প্রচারে অংশ গ্রহণ করেন। অবশেষে সত্যানুসন্ধানীরূপে পুনরায় আকিয়াবে যান এবং সেখানে কোন্ডলী মহাশ্মাশন এবং চারিপোক্ত মহাশ্মশানে দীর্ঘদিন ধ্যান অনুশীলন করেন। ১৯৩৭ খৃষ্ঠাব্দ হতে চট্টগ্রামের পটিয়া ও রাঙ্গুনীয়ায় ধ্যান চর্চা করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নত মার্গের অধিকারী হন।

১৯৫৪-৫৬ খৃষ্ঠাব্দে মায়নমারের (বার্মার) রাজধানী ইয়ানগুণের (রেঙ্গুন) অদূরে কাবায়ে (বিশ্বশান্তি প্যাগোডার পাষাণ গুহা) অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ মহাসংগীতিতে অংশগ্রহণ করেন। মহাসংগীতি শেষে মায়ানমারে বসবাসরত বাংগালী ও বিদেশী বৌদ্ধদেরকে বাংলা, ইংরেজী এবং হিন্দী ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম দেশনা করে সেখানকার বৌদ্ধদেরকে অভিভূত করেন। তাঁর প্রাঞ্জল ধর্ম দেশনায় অভিভূত শ্রীলংকা সরকার তাঁকে পাঁচ বছরের বৃত্তি প্রদান করে শ্রীলংকায় ধর্ম অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য। শ্রদ্ধেয় মহাথেরর শাস্ত্র জ্ঞান ও শাস্ত্র ব্যাখার পদ্ধতিতে মুগ্ধ পণ্ডিতবর্গ তাঁকে ত্রিপিটক বাগ্মীশ্বর অভিধায় ভূষিত করেন। তিনি কলিকাতা নগরীতে ফিরে এসে ২৪ পরগনার বৌদ্ধপল্লী ইছাপুরের আনন্দধামে বুদ্ধ চর্চায় আবিষ্ট ছিলেন। নানা গুণে গুণান্বিত মহাথের মহোদয়ের ধ্যান চর্চা এবং সাহিত্য চর্চার ফলে বৌদ্ধ জনসাধারণ তাঁর অমূল্য ১২ খানি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ লাভ করে। সেগুলি হলঃ- Emi-

nence of Buddha and His Dhamma, Buddhism A Human Religion, সত্য সাধনা, বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম, উপাসনা, মহামঙ্গল, ধর্মসূধা, আনন্দলোকে, সত্য সংগ্রহ, আদর্শ বৌদ্ধ জীবন, অমৃতের সন্ধানে, আমার সমাজ। এই মহান সত্যানুসন্ধানীকে জানতে হলে আমাদেরকে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতে হবে–'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে সত্য সুন্দরমন্ব-এর অনুসন্ধানী হতে হবে, তবেই সার্থক আদর্শ বৌদ্ধরূপে আখ্যায়িত হওয়া সম্ভব হবে। মহাপুরুষের চিন্তা চেতনাকে চির জাগ্রত রাখার একমাত্র উপায় তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদির পুনঃ প্রচার এবং উত্তরাধিকারীদের সঠিক পথ নির্দেশনা।

পরম শ্রদ্ধেয় সংঘনায়ক শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাথের তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন ৪টা মার্চ ১৯৯৯ কিন্তু আমরা তাঁকে নিত্য স্মরণ করবো। তাঁর লেখা হতে উদ্ধৃত করছি তাঁর চিন্তা-চেতনার সঠিক মূল্যায়নের জন্য। "শ্রেষ্ঠ তদ্ধেতু কঠোর ভিক্ষু জীবনের মূল্য এবং ভিক্ষুকৃত অপ্রমেয় উপকার যে সমাজ বুঝতে পারে না সেই অজ্ঞ অন্ধ হীন সমাজে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবক ভিক্ষু হতে পারেন না। তেমন কোন ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষিত ভিক্ষুর পক্ষেও সে-সমাজে ভিক্ষুরূপে অবস্থান করা সম্ভব হয় না।.....যোগ্য ভিক্ষু ও যোগ্য দায়কের উপর নির্ভর করে বুদ্ধের শাসন যান প্রবর্তিত হয়।।.....নিকায় ভেদের কারণে ধর্মগুরু ভিক্ষুরা ধর্মের নামে অন্যায়-অধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করায় বড়ুয়া সমাজে বহু অন্যায় অধর্ম আশ্রিত হয়ে ধর্ম ও সমাজের বহু ক্ষতি করে এসেছে ও আস্‌ছে"। সত্যানুসন্ধানী সংঘনায়ক আরো লিখেছেন "সত্যের জন্য আমাদের কাজ করা উচিত, বাঁচা উচিত এবং প্রয়োজন হলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সবাই জ্ঞানী ও সুখী হউক।ঃ (বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম ১৯/২০ পৃষ্ঠা)।

অখিল ভারত ভিক্ষু সংঘনায়ক শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র মহাথের জীবন চর্চায় পুষ্ট হোক বৌদ্ধ সমাজ।

বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ

পহেলা বৈশাখ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
২৫৪৪ বুদ্ধাব্দ/১৪/০৪/২০০০খৃঃ

অনুবাদকের কথা

সত্য মহান ও সুন্দর। সত্য সকলকে অমঙ্গল হতে মুক্ত রাখে। সত্য যুক্তি তর্কের উর্ধে। সত্য অনুসন্ধানের জন্যই যুক্তি তর্ক। প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক, মালয়শিয়ার প্রধান বৌদ্ধ নায়ক-মহাথের বুড্ডিষ্ট মিশনারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ড. কে শ্রী ধম্মানন্দ Buddhism and Free Thinkers পুস্তিকায় বৌদ্ধ ধর্মে মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা এবং সত্য ধর্ম নির্বাচনে মুক্ত চিন্তার ভূমিকা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখা করেছেন। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মের গোঁড়ামি নিরসনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে উপকৃত হবেন মনে করে পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদে প্রয়াস পেয়েছি। লেখকের ভাব ও ভাষার প্রতি দৃষ্টি রেখে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করেছি।

পালি বুক সোসাইটির প্রাণপুরুষ, প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রী বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়ার বার বার তাগিদ না থাকলে এই অনুবাদ যথাসময়ে সম্পন্ন হতো না। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পুস্তিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এ জন্যে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। পালি বুক সোসাইটি সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক পুস্তক ও বার্ষিকী প্রকাশ করে প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ জন্যে নূতন বছর, শতাব্দী ও সহস্রাব্দে সোসাইটি ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

বেতাগী, চট্টগ্রাম।
১লা জানুয়ারী, ২০০০।

জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া

নিবেদন

'পনার পরলোকগত পূজনীয় ব্যক্তির স্মৃতিতে ধর্মীয় বই প্রকাশ রুন। আমরা আপনাকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবো। র্মীয় বই হউক সুশীল সমাজ গড়ার সহায়ক শক্তি।

চারুবালা বড়ুয়া
সভানেত্রী
প্রচার ও প্রকাশনা পর্ষদ
পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ।

আমরা, জনগণের কায়িক, বাচনিক পরামর্শ, লেখা ও আর্থিক দানে এ দুরূহ কর্মে নিয়োজিত। উদ্দেশ্য সত্য ধর্ম প্রচার। আমাদেরকে অনেকে আর্থিক এবং প্রবন্ধ ও গ্রন্থ দান করে উৎসাহিত করেছেন, বর্তমানে করেছেন। আমাদের সোসাইটির এক কর্মী বিপদে পরে বাংলাদেশ বৌ সামিতির সুযোগ্য চেয়ারম্যান রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া হতে অর্থ ধার নিয়েছিলেন উক্ত অর্থ শোধ করতে গিয়ে স্থম্ভিত হন তাঁর অমায়িক ব্যবহারে। তিনি পুরে অর্থই ধর্মদানে ব্যবহার করার জন্য অর্পণ করেন সোসাইটিকে। বিগত ৯ ৪/২০০০ইং জানা যায় শ্রদ্ধেয় সংঘনায়ক শ্রীৎ আনন্দমিত্র মহাথেরর প্রি শিষ্য শ্রীস্মৃতি মিত্র ভিক্ষুর নিকট তিনি পহেলা বৈশাখ ১৪০৭ বঙ্গাবে প্রবৃজ্যিত হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় সংঘনায়কের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজি অনুষ্ঠানে। সোসাইটির কর্মীবৃন্দ আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবশে এই পুস্তিক প্রকাশের মাধ্যমে প্রয়াত সংঘনায়ক শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র মহাথেরর পারলৌকিক শান্তি, শ্রদ্ধেয় লেখক মহানায়ক থের ও তাঁর লেখার অনুবাদক সোসাইটি কল্যাণকামী শ্রী জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া এবং জননেতা রাখাল চন্দ্র বড়ুয়ার দী জীবন ও মঙ্গল কামনা করছে।

প্রচার ও প্রকাশনা পর্ষদ
পালি বুক সোসাইটি, বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম।

১লা বৈশাখ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
২৫৪৪ বুদ্ধাব্দ/১৪/০৪/২০০০।

বৌদ্ধ ধর্ম ও মুক্তচিন্তা

তথাকথিত মুক্তচিন্তাবিদেরা প্রকৃত মুক্তচিন্তাবিদ নন, তাঁরা মুক্ত চিন্তা করতে ক্লান্তিবোধ করেন। তাঁরা যেহেতু গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে চান না এবং তাঁদের জীবনের তাৎপর্য বিবেচনা করেন না, তাই তাঁরা মনে করেন তাঁরা মুক্ত চিন্তাবিদ। বৌদ্ধ ধর্মে এ'ধরণের চিন্তাবিদের স্থান নেই। বৌদ্ধ ধর্ম গভীর ও নিরপেক্ষ স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করে।

বুদ্ধত্ব লাভের পর বিরাট শিষ্য সমাবেশে বুদ্ধ বলেছিলেন 'ভিক্ষুগণ, তোমরা এবং আমি এখন জাগতিক ও ঐশ্বরিক বন্ধনমুক্ত।' এ কথার মধ্যে আমরা স্বাধীন চিন্তার ইংগিত পাই। সাধারণত ঐশ্বরিক বন্ধন আরোপ করে এবং ঐশীবাণীর বরাত দিয়ে মানুষ নিজেদের ধর্মীয় মতবাদ, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তনের চেষ্টা করে। বুদ্ধ এসব ধারণা প্রত্যাখান করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি নিজে এবং তাঁর শিষ্যরা ঐশ্বরিক ও মানবীয় বন্ধন থেকে মুক্ত।

এসব বন্ধন কি কি? বন্ধনগুলো হল ধর্মের নামে মানুষের মনে ভীতি ও সন্দেহ জাগিয়ে সৃষ্টি করা নানা রকম বিশ্বাস, লোভ, মোহ, মতবাদ, পরম্পরাগত প্রথা ও রীতিনীতি। এসব বিশ্বাস ও আচরণে পরাভূত লোকেরাই দাসত্বের নিগড়ে বন্ধি। বুদ্ধকে কেন আমরা মুক্ত চিন্তাবিদ বলি বা বৌদ্ধ ধর্মকে কেন স্বাধীন ও মুক্তির ধর্ম বলি ?

সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা

সত্য উপলব্ধির জন্য কোন দেবতা, বুদ্ধ বা অন্য কোন শিক্ষা গুরুর উপর নির্ভরশীল না হয়ে বুদ্ধ মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার দিয়েছেন। এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা। পাশ্চাত্যের পন্ডিতদের মতে বৌদ্ধ ধর্ম 'স্বাধীনতা ও যুক্তির ধর্ম'। স্বাধীনতা অবশ্যই যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হতে হবে। অন্যথায় মানুষ স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সরকার যদি জনসাধারণকে তাদের খুশীমত যে কোন কাজ করার ও যে কোন স্থানে বসবাস করার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেয়, তাহলে আমি নিশ্চিত, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তারা দেশকে ধ্বংস করতে পারবে।

মানুষের মনে সর্বপ্রথম যুক্তির বিকাশ না ঘটিয়ে স্বাধীনতা দেয়ার বিপদ ওখানেই। ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে একই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

অনেকে যদিও বলে থাকেন যে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য মানুষের আছে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কিন্তু আমরা জানি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা ছাড়া সেই ইচ্ছার প্রয়োগ দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। একটি শিশুর স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে পারে কিন্তু তাকে বিদ্যুতের জীবন্ত তার দিয়ে খেলা না করার শিক্ষা দিতে হবে।

বুদ্ধ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে স্বাধীন ইচ্ছা বাইরের কোন উৎসের দান নয়, এটা অন্তর্নিহিত। মানবিক আচরণ, মানবিক চরিত্র, মানবীয় অন্তর ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য অনেক জীবন ধরে উৎকর্ষ লাভ করে আসছে। আমরা সংস্কৃতিবান কি অসংস্কৃতিবান, সভ্য কি অসভ্য, ধার্মিক না অধার্মিক, ভাল না খারাপ, দুষ্ট না শিষ্ট এসব নির্ভর করে আমাদের মানস প্রকৃতির উপর যা বিগত জীবনের পর জীবন ধরে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য কেউ প্রদান করেনি।

সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারাকে দিক নির্দেশনার জন্য ও পরিচালনার জন্য ধর্ম একান্ত প্রয়োজন। ধর্মের উদ্দেশ্য হল মনকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে সহায়তা দেয়া যাতে সে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং নৈতিক দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতে পারে। সে ভাল করতে পারে কারণ সে জানে যে সে সঠিক কাজই করছে, কোন পুরস্কার বা তিরস্কারের খাতিরে কাজটাকে সে এড়িয়ে যাচ্ছে না। ধর্ম আত্মোন্নতির সহায়ক।

কেন আমদের অন্যের উপর নির্ভর করা উচিত নয়? কেউ একজন শাস্তিদাতা আছেন এই ভয়ে যদি আমরা আমাদের খারাপ, নীতিহীন ও স্বার্থপর চিন্তা বন্ধ করি, তবে আমরা জ্ঞান, সদিচ্ছা ও সহানুভূতি অনুশীলনের জন্য কখনো সুযোগ পাব না। অনেকে বড় পুরস্কারের আশায় কোন কোন সময় ভাল কাজ করে বা অন্যদের সেবায় নিয়োজিত হয়। সেটাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে তারা সত্যিকার অর্থে সহানুভূতি ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করতে পারবে না। তারা স্বার্থপরতার সাথে শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে মন্দকাজ এড়িয়ে চলে বা পুরস্কারের জন্য ভাল কাজ করে। এটাই

স্বার্থপরতা। বুদ্ধ এটা সমর্থন করেননি। স্বর্গ-নরক দুটোই যদি বন্ধ করে দেয়া হয় তবে কতজন ধর্মনিষ্ঠ পাওয়া যাবে? বৌদ্ধধর্ম স্বর্গ-নরকের সুখ ও ভীতি না দেখিয়ে নৈতিক আচরণকে উৎসাহিত করে। বুদ্ধের শিক্ষায় এটাই অসামান্যতা।

মুক্তি ও যুক্তির ধর্ম

ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য পাপের শাস্তি এড়ানো বা পুণ্যের পুরস্কার লাভের পথ নিশ্চিতকরণ নয় বরং মানুষ হিসেবে পূর্ণতালাভে সহায়তা করা এবং দেহ মনের দুঃখকষ্ট বিলোপ সাধন ও সকল প্রকার অসন্তোষ থেকে মুক্তি লাভ করা।

বুদ্ধও চেয়েছিলেন নৈতিক নিয়মরীতি, শৃঙ্খলা ও চরিত্র অনুযায়ী মানবতার অনুশীলন। কিন্তু এসব অর্জন করতে হবে স্বর্গলাভের প্রতিশ্রুতি বা নরকের আগুনের ভয়ে ভীত হয়ে নয়। এজন্য বৌদ্ধ ধর্মকে মুক্ত ও যুক্তির ধর্ম হিসেবে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধ অনুসন্ধান ও উপলব্ধির জন্য আমাদের স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। চিন্তাভাবনা না করে শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আমরা হঠাৎ কিছু গ্রহণ করব না। বুদ্ধ বলেছেন, 'শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোনকিছু গ্রহণ করো না, কারণ এটা সত্য উপলব্ধির জন্য কঠিন হয়ে উঠবে কেননা এই বিশ্বাস তোমাকে অন্ধ অনুগামী করে তুলবে।'

এই অন্ধবিশ্বাস ধর্মোন্মত্ততায় পরিণত হতে পারে। বিচার বুদ্ধি দিয়ে সত্যমিথ্যা যাচাই করার চেয়ে মানুষ ধর্মগুরুর প্রতি আবেগাপ্লুত হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এর কারণ হল, নৈতিক অনুশীলনকে কেন উচ্চ স্থান দিতে হবে এবং কেন অনৈতিক কাজ পরিহার করতে হবে এসব বিষয়ের বিশ্লেষণ ক্ষমতা তারা অর্জন করেনি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি ছেলে যখন কোন কিছু ভাল করে বুঝতে পারে না, বেশী দুষ্ট হয় তখন মা-বাবা তাকে ভয় দেখায়, মারে এবং ভুল না করার জন্য শাসন করে। ভয় পেয়ে সে আর দুষ্টামি করে না, কিন্তু সে কি দোষ করল বা তার ভুল কোথায় তা তাকে বুঝানো হয় না। এটা শুধু শাস্তির ভয় সৃষ্টি করে। আবার যখন সে তাদের নির্দেশমত কোনকিছু করতে অসম্মতি জানায় তখন মা-বাবা তাকে পুরস্কারের লোভ দেখায়।

ছেলেটি তখন কিছু না বুঝে মা-বাবার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সে আবারো খুব সহজে ভুল করতে ও ভুল বুঝতে পারে। সেরূপ মানুষকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না দিয়ে পুরস্কারের লোভ দেখিয়েও শাস্তির ভয় দেখিয়ে কোন ধর্ম প্রবর্তন করা উচিত নয়।

আমরা যদি শাস্তি ও পুরস্কারের মাধ্যমে ধর্ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করি, মানুষ ধর্মের প্রকৃত বৈধতা ও মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। এজন্যে বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মীয় শাস্তির কোন ভয় নেই। ধর্মের কর্তব্য হল মানুষকে নির্দেশনা ও শিক্ষা দেয়া এবং জ্ঞানালোকিত করা।

দেশের প্রচলিত আইনই শাস্তির দেয়ার কাজ করবে। ধর্মের পক্ষে আইনের ভূমিকা নিয়ে শাস্তি প্রয়োগ করা উচিত নয়। অন্যথায় জ্ঞান উপলব্ধির পরিবর্তে ভয়ই বিরাজ করবে। বুদ্ধের শিক্ষাদানের এটাই বৈশিষ্ট্য এবং এজন্যেই তাঁকে আমরা মুক্ত চিন্তাবিদ হিসেবে শ্রদ্ধা করি।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

বুদ্ধের সময়ে একদল যুবক স্বাধীনভাবে কি করে একটি ধর্ম বাছাই করবে তা বুঝতে পারছিল না কারণ ভারতে তখন ষাটটিরও বেশী ধর্মমত প্রচলিত ছিল। তাই তারা বুদ্ধের কাছে এসে তাদের সমস্যার কথা ব্যক্ত করল। তারা বলল, কি করে প্রকৃত ধর্ম নির্বাচন করতে হয় তা তারা জানে না। বুদ্ধ তাদেরকে বলেননি যে বৌদ্ধ ধর্মই একমাত্র খাঁটি ধর্ম এবং অন্যসব ধর্ম ভুল। তিনি এই যুবকদের কোন শিক্ষক বা ধর্মীয় নেতার কর্তৃত্বের উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার জন্য নীতিবিষয়ক কিছু উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ বুদ্ধনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বুদ্ধ মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার জন্য কিছু উদার উপদেশ দেন, সারাদেশের বুদ্ধিজীবিরা তাঁর এই মনোভাবের প্রশংসা করেন। বুদ্ধ এই দাবী করেননি যে তিনি একমাত্র সত্য ধর্মের প্রবক্তা এবং কেউ তাঁর দর্শন লাভ করলে পূজা ও প্রার্থনা করলে ত্রাণলাভ করবেন, পাপ মোচন হবে, স্বর্গে যেতে পারবেন বা মৃত্যুর পর নির্বাণ লাভ করবেন। অন্যান্য ধর্ম গুরুকে অশ্রদ্ধা করার পরামর্শও তিনি কখনও দেননি। তিনি বলেছেন, 'যারা শ্রদ্ধার যোগ্য তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করবে।' কোন কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে নিজের ধর্ম গুরু ছাড়া অন্য ধর্ম গুরুকে মান্য করলে বা শ্রদ্ধা জানালে তাদের পাপ হবে।

এর কারণ হল অনেক ধর্ম গুরু তাদের শিষ্যদের সাবধান করে দেন যে তাঁরা যদি অন্য ধর্মস্থানে যায় বা অন্য ধর্মের বই পড়ে বা অন্য ধর্মের ধর্ম কথা শুনে তবে তাদের পাপ হবে এবং তারা নরকে নিক্ষিপ্ত হয়ে শাস্তিভোগ করবে। অন্য ধর্মের প্রতি তারা বিরক্তিভাব দেখাতে চায়। এই মনোভাব ভয়ের সৃষ্টি করে এবং মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখে। বৌদ্ধ ধর্ম এই ধরনের অসহনশীলতার মনোভাববে নিরুৎসাহিত করে। বুদ্ধ আরো বলেছেন, 'সত্য যেখানেই থাকুক তাকে গ্রহণ করো। ধর্ম বিচার না করে প্রত্যেকের পাশে এসে দাঁড়াও।'

সরল নিরীহ লোকদের অজ্ঞানান্ধ করে রাখা ও বিপথগামী করা অনুচিত। মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে তারা ধর্মের নামে অপপ্রচার চালায়। এজন্যে অনেকে ধর্মকে উপদ্রব বলে মনে করেন। বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের জন্য মানুষের মধ্যে শুভেচ্ছা, ঐক্য, সাম্য ও সহমর্মিতা ধ্বংস হয়। এ ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ ধর্মীয় মনোভাবের জন্য কোন কোন সময় একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হয়।

বিগত ২৫০০ বছরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য বৌদ্ধেরা কখনও আক্রমণাত্মক বা বিরোধপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেনি। এ কারণে অন্য ধর্মানুসারীদের বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্যে বৌদ্ধেরা কখনও নৈতিকভাবে অসমর্থনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। অন্য ধর্মনুসারীরা পাপী ও বিপথগামী এই চিন্তা করে বৌদ্ধেরা তাদের ধর্মন্তরিত করা যুক্তিসংগত মনে করে না। বুদ্ধ কারো পাপ ক্ষমা করার বা কাউকে পাপমুক্ত করে পবিত্র করার জন্য কখনও কোন পদ্ধতির বিধান দেননি।

উদাহরণ হিসেবে, আপনি যখন আপনার ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে অন্যদের তুলনা করেন তখন আপনি জন্ম থেকে আমরণ যে স্বাধীনতা ভোগ করেছেন তার মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন। বৌদ্ধ ধর্মে বিবাহের জন্য ধর্মীয় আইন না থাকায় বিবাহ অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুশাসনে করতে হয় না, তাই স্বর্গে নথিভুক্ত হওয়ার যুক্তিতে বৌদ্ধেরা বিবাহ বিচ্ছেদ অসম্ভব বলে বিশ্বাস করে না। বিবাহ যদি স্বর্গে নথিভুক্ত হয়ে থাকে তবে নথি থেকে মুছে ফেলার অনুরোধ জানিয়ে এটা বাতিল করাও নিশ্চয়ই সম্ভব! এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা নয় কি?

ধর্মের মাধ্যমে কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যেসব শিক্ষা দেয়া হয় সেসব শিক্ষা আমরা আইন হিসেবে নয় বরং স্বাধীন মতানুযায়ী গ্রহণ করি। নিজেদের বিশ্বাস ও জীবনধারার সাথে সঙ্গতি রেখেই আমাদের কাজ করতে হয়। ধর্মীয় প্রভুদের পূর্ব থেকে তৈরী করা ধর্মীয় নীতি আমরা অন্ধভাবে কোনমতেই গ্রহণ করতে পারি না। ভীতিসন্ত্রাত মনে ধর্ম মেনে নেয়া উচিত নয়; ধর্ম গ্রহণ করতে হবে খোলা অন্তর নিয়ে, কিভাবে অন্যের সেবায় জীবন বিলিয়ে দেয়া যায় এবং জীবনের অর্থ উপলব্ধি করা যায় তাই মুক্তমনে শিখে নিতে হবে।

আজকাল পৃথিবীর সব দেশে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তারা প্রচলিত ধর্মের প্রতি বিবাদে লিপ্ত হয়, বিদ্বেষ পোষণ করে এবং ঘৃণা উদ্রেকের জন্য অন্যদের প্ররোচিত করে। এমনও অনেকে আছেন যারা তাদের দুতিন হাজারেরও অধিক প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা জীবন ধারার অঙ্গ হিসেবে তাদের ধর্ম অনুশীলন করে আসছেন। সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার, উন্নত মনোবিজ্ঞান, দর্শন এবং মর্যাদাপূর্ণ, নির্দোষ, ধার্মিক ও নৈতিক জীবন তাদেরকে উন্নত জীবন যাপনে সহায়তা করেছে। তা সত্ত্বেও কোন কোন ধর্মীয় গোষ্ঠি তাদের ধর্ম গ্রহণের জন্য অন্যদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে, তাদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যেন স্বর্গ তাদের একচেটিয়া সম্পদ এবং এর একক কর্তৃত্ব যেন তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। তারা দাবী করে কেবলমাত্র তাদের ধর্মের মাধ্যমেই স্বর্গে যাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে অন্য সকল ধর্ম অনুসারীরা এমন কি যাদের নির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় মার্কা নেই তারাও স্বর্গে যেতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলীর অনুশীলন, মানসিক জীবনের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং মানবিক মর্যাদাও বুদ্ধিবৃত্তির পরিপোষণ।

কোন কোন ধর্মানুসারীর মতে শুধু নির্দোষ জীবন যাপন করলে স্বর্গে যাওয়া যায় না যদি না ঈশ্বরকে মেনে নেয়া হয়। কিন্তু একজন অপরাধী যে সব রকমের অপকর্ম করে, আইন ভংগ করে, নিরপরাধী লোকের জীবন বিপদাপন্ন করে শুধুমাত্র মৃত্যু পূর্বক্ষণে 'আমি বিশ্বাস করি' এই উচ্চারণে স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ পায়। তারা বলেন, আপনি যদি তাদের ধর্ম মেনে নেন তবে জীবনে যত পাপই আপনি করে থাকেন না কেন ঈশ্বর সব ক্ষমা করে দেবেন এবং আপনাকে সরাসরি স্বর্গে প্রেরণ করবেন।

নিরপরাধ লোকের সুখশান্তি বিনষ্ট করে অপবাধী স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ পায়, তাদের মতে ঈশ্বর অপরাধীকে রক্ষা করেন কিন্তু অপরাধীর শীকার যারা হয়েছেন তাদের প্রতি ঈশ্বরের কোন সহানুভূতি নেই।

অনেকের ক্ষতিসাধন ও বিস্তর কুকর্ম করার পরও যদি ঈশ্বর পাপীকে রক্ষা করতে পারেন, তবে কুকর্ম করার আগে কেন সে সব বন্ধ করা তাঁর পক্ষে কঠিন কাজ হবে ? বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে কোন মানুষ সে যে কোন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হোক না কেন, এমন কি সে যদি বলে যে তার কোন ধর্ম নেই, সে যদি সুন্দর সংস্কৃতিবান হয়, কারো কোন ক্ষতিসাধন না করে এবং শান্তজীবন যাপন করে তবে বৌদ্ধ দৃষ্টিতে তাকে মর্যাদাসম্পন্ন লোক বলে গণ্য করা হবে।

আমরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তা হলো আমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রবর্তিত বহু ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠান যা তারা তাদের সে যুগের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী প্রবর্তন করে গেছেন। এসবে ছিল তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। অতীতে বিজ্ঞান ও জগত এবং বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্বন্ধে তাদের বাস্তব জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। ভয় ও অজ্ঞতার তাড়নায় তারা বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্ম শুরু করে। পরবর্তীতে এসব অভ্যাস ঐতিহ্যে পরিণত হয়। এই ঐতিহ্য তখন সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করে। বৌদ্ধ হিসেবে আমরা এসব প্রচলিত রীতি আমাদের বিভিন্ন সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করি।

কিন্তু আমরা মনে করি না যে এসব ঐতিহ্য গ্রহণ ও অনুশীলন করতে আমরা বাধ্য। আমরা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা করি এবং একই সাথে এগুলো সত্যিকার অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ কিনা এবং আমদের ও অন্য সকলের জন্য মঙ্গলদায়ক কিনা তা অবশ্যই যাচাই করে দেখি। যদি সকলের জন্য মঙ্গলময় হয় তবে নিশ্চয়ই আমরা তা গ্রহণ করব, তা যদি না হয় তবে আমরা নিজেদের স্বাধীন মতানুযায়ী তা বাতিল করব এবং আধুনিক জীবনধারার উপযোগী নূতন ধারা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করব।

কিভাবে ধর্ম নির্বাচন করবেন

ধর্ম নির্বাচন করার সময় জনশ্রুতি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অনেকেই আমাদের কাছে এসে তাদের শিক্ষক, গুরু, প্রভু, ধর্মীয় আচার ও দেবদেবী

সম্বন্ধে বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার মজাদার গল্প বলবে। তারা ঘটনা বা কাহিনীকে অতিরঞ্জিত করে, চমক লাগিয়ে বর্ণনা করবে এবং তাদের ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বলবে। বুদ্ধের উপদেশ হল তাদের কথা সতর্কতার সাথে বিবেচনা না করে গ্রহণ করবে না। আমাদের আছে মানবীয় চিন্তার মন কিন্তু আমাদের দুর্বলতার জন্য সেই মনকে নিরপেক্ষভাবে চিন্তার সুযোগ দিই না।

নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি যুক্তি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করে কোন বিষয় গ্রহণ না করার জন্য বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছেন, যদি তা না করি তবে আগে বা পরে আমরা দেখব যে তাড়াহুড়া করে যা আমরা গ্রহণ করেছি তা ভুল।

গভীরভাবে অধ্যয়ন না করে কোন পবিত্র গ্রন্থের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। কেউ কেউ বলে থাকেন তাদের পবিত্র গ্রন্থই সত্য, অন্যসব ভুল। তারা আরো বলেন তাদের গ্রন্থের ঐশী বাণী তাদের ধর্মীয় গুরু কর্তৃক ধারণকৃত ও নথিভুক্ত, তাই বিনাপ্রশ্নে তা গ্রহণ করা উচিত। সতর্ক বিবেচনা ছাড়া পবিত্র গ্রন্থের কোন বিষয় গ্রহণ না করার জন্য বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছেন। অন্যকোন ধর্মগুরুর নিকট কি আপনি এ ধরনের বাক্য শুনেছেন? বুদ্ধ মানবীয় বুদ্ধি বৃত্তিকে সম্মান দিয়েছেন। ধর্ম অন্বেষণ করার কত স্বাধীনতা তিনি আমাদের দিয়েছেন।

বৌদ্ধ মতে, নিজেদের পুস্তকে মানুষ অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করতে পারে এবং পরে সে সবকে পবিত্র গ্রন্থ ও স্বর্গীয় বাণী হিসেবে প্রচার করতে পারে। মানুষ তখন বিনাপ্রশ্নে এসব মেনে নেয়। ধর্মীয় নেতারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদেরকে ছোটদের মত নিয়ন্ত্রণ করে। তারা তাদের পূর্ব প্রস্তুত মামুলী ধর্মমত বিশ্বাস ও পালনের জন্য মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়। তাই সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে এসব যাচাই বা উপলব্ধি করার কোন সুযোগ থাকে না।

বুদ্ধ আরো বলেছেন শুধুমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে কেউ যেন কোন কিছু গ্রহণ না করে। যদিও আমরা যুক্তি ছাড়া কিছু না করার জন্য উপদেশ দিয়ে থাকি; বুদ্ধ বলেছেন আমরা যেন শুধুমাত্র যুক্তি নির্ভর না হই। যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা আমাদের খুবই সীমিত। ছোট ছেলেরাও তাদের নিজস্ব উপায়ে যুক্তি দিতে পারে। আমরা নিজেদের চিন্তনের ক্ষমতানুযায়ী কিছু কিছু যুক্তি

খাড়া করতে পারি। আমরা যখন আমাদের যুক্তিসমূহ প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বা বিজ্ঞানীদের যুক্তির সাথে তুলনা করি তখন আমরা দেখতে পাই যে এই বিখ্যাত পণ্ডিতদের চোখে আমাদের যুক্তিগুলো নির্ভুল নয়। আবার যখন এই পণ্ডিতদের যুক্তি আলোকিত্ ধর্মীয় শিক্ষকদের যুক্তিধারার সাথে তুলনা করি তখন আমরা বুঝতে পারি বুদ্ধিবিদদের যুক্তিও সম্পূর্ণ নয়।

তাই বুদ্ধ বলেছেন, তোমার ক্ষমতার মধ্যেই সত্যকে গ্রহণ করো তবে এটাকে এখনই চূড়ান্ত সত্য বলে দাবী করো না। তোমার মনকে যুক্তি বের করতে দাও; এটাকে বর্ধিত করতে, উন্নত করতে সুযোগ দাও। মনের দ্বার এখনই রুদ্ধ করে রেখো না। তুমি এখন যা গ্রহণ করেছো, পরে তা অভিজ্ঞতা, পরিপক্ষতা ও সঠিক উপলব্ধির আলোকে পরিবর্তিত হতে পারে।

তিনি আরো বলেছেন তর্কের মাধ্যমে কিছু গ্রহণ করবে না। যুক্তি নির্ভর করে সামর্থ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা এবং প্রতিভাদীপ্ত মনোভাবের উপর, সত্য ও তথ্যের উপর নয়। তর্ক আবেগ ও অহমিকা জাগিয়ে তুলতে পারে।

মানব জীবনের তিনটি বৈশিষ্ট্য

ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হল, পূজা-অর্চনা, প্রার্থনা ও আচার অনুষ্ঠান পালনে বেশী সময় ব্যয় না করে কিভাবে উন্নত মানবীয় ধারা, নৈতিক চরিত্র, শৃঙ্খলা অনুশীলন করা যায়; সুখ, শান্তি ও মনের বিশ্বাস অটুট রাখা যায় এবং ভয়, উদ্বেগ, ক্রোধ হিংসা ও প্রচঞ্চনা থেকে মুক্ত হওয়া যায় এ সবের প্রতি অখন্ড মনোযোগ দেয়া।

মানব জীবনের তিনটি বৈশিষ্ট্য, তা হল- পশু স্বভাব, মানবীয় স্বভাব ও স্বর্গীয় বা উন্নত স্বভাব। মানুষের মধ্যে পশু স্বভাব গোপন করার জন্য বা দমন করার জন্য ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমরা শুধু পূজা-অর্চনা দিয়ে অর্জন করতে পারি না। শুধু খাওয়া পড়া ও সন্তান উৎপাদনে জন্য যদি জীবন ধারণ করতে হয় তবে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

কিন্তু মানুষ পশু থেকে ভিন্ন, এর কারণ মানুষকে সর্বোচ্চ মানসিকতায় উন্নীত করার জন্য শিক্ষা দেয়া যায়। এ কাজে সহায়তার জন্য ধর্ম একটি শক্তিশালী উপাদান।

মানুষের মধ্যে আছে এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যাকে বলা হয় ধর্ম।

ধর্মের ভিত্তি হল মানবিক গুণাবলী। মানুষের আছে লজ্জা ও ভয়। লজ্জা ভয় কি? পাপের ভয়; নষ্টামি, নিষ্ঠুরতা, বিপদজনক কাজ করার ভয়, এসবকে বলা হয় নৈতিক ভয়। অপরদিকে মানুষ হিসেবে কোন খারাপ অনৈতিক কাজ করা আমাদের জন্য লজ্জাজনক। এটা নৈতিক লজ্জা। মানবিক মর্যাদা রক্ষা করতে ও মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকৃত সম্মান জানানোর জন্য আমাদের মাঝে নৈতিক লজ্জা ও নৈতিক ভয় বাড়াতে হবে।

জগতে আমাদের জন্য আছে অনেক ধর্ম ও ধর্মস্থান। বিশেষ করে প্রাচ্যে গীর্জা, মসজিদ, মন্দির ও তীর্থস্থানের ঠাসাঠাসি অবস্থান, দেখে মনে হয় ধর্মের বেশ উন্নতি হচ্ছে। সব জায়গায় দেখি পূজা ও প্রার্থনা চলছে, ধূপবাতি-মোমবাতি জ্বালানো হচ্ছে। কিন্তু এই পূজারীদের মধ্যে কজনের নৈতিক ভয় ও নৈতিক লজ্জা আছে? এই স্বাভাবিক গুণাবলী যদি তাদের মধ্যে না থাকে তবে সেখানে প্রকৃত ধর্ম থাকতে পারে কি? সত্যিকারভাবে এসব লোকের অনেকের মধ্যে মানবীয় গুণটুকু পর্যন্ত নেই অথচ এরা উচ্চ কণ্ঠে নিজেদের ধর্ম প্রচার করে।

ধর্মীয় নীতির গুরুত্ব

ধর্ম বিভিন্ন উপায়ে মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটাতে পারে। এই গুণবলী কি কি? অন্যদের কোন ক্ষতি না করে বা বিরক্তি উৎপাদন না করে জীবন যাপনের শিক্ষা থাকতে হবে। এই শিক্ষা অন্য অনেক শিক্ষার চেয়ে জরুরী। পরস্পরের প্রতি সমঝোতা ও শুভেচ্ছার মনোভাব অনুশীলন করতে হবে। প্রার্থনা করি বা না করি আমাদেরকে ধৈর্য, পরমত সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি ও বিশ্বস্ততার অনুশীলন করতে হবে। আজকের জগতে কতজন মানুষের মধ্যে প্রকৃত সততা আছে? প্রকৃত ধর্ম এসব গুণের অনুশীলন শেখায়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা আনবিক শক্তি সমগ্র জগতে পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু এই একই শক্তিবলে মানুষের মন পরিবর্তন করতে পারে না। তবে কিভাবে এই পরিবর্তন সম্ভব ? আমরা জানি দেবতার পক্ষেও মানুষের মনে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। বাইরের কোন শক্তি এ কাজ করতে পারে না। আমরা নিজেরাই আমাদের মনকে পরিবর্তন করতে পারি। বুদ্ধের মতে এ জগতে মন পরিবর্তন করার কেউ যদি থাকে, তা মানুষ নিজেই– একমাত্র মানুষ নিজেই নিজের মন পরিবর্তন করতে পারে, অন্য কেউ নয়।

এটা কিভাবে করতে হয় আমরা তার ধারণা পেতে পারি। মনকে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা আমরা পেতে পারি। উপলব্ধি ও সংকল্পের মধ্য দিয়ে আমরা মনের উৎকর্ষ সাধন করতে পারি। এজন্যে জ্ঞান অপরিহার্য। মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্মীয় নীতি অনুসরণে মনের পরিবর্তন হয়। তাই ধর্ম যাই হোক না কেন ধর্মীয় নীতি খুবই প্রয়োজন, তা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা ইসলাম যে ধর্মই হোক না কেন তাতে কোন পার্থক্য নেই। যদি ভাল গুণাবলী অনুশীলন করা হয় তবে নির্বিচারে প্রত্যেকের স্বর্গভোগ করার সুযোগ পাওয়া উচিত। স্বর্গ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয় বা বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার নয়। স্বর্গ সদগুণসম্পন্ন প্রত্যেক লোকের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত।

বৌদ্ধমতে স্বর্গ হল সুখ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী পরিতৃপ্তির একটি স্থান। এক হিসেবে বলা যায় যে আনন্দ আমরা পৃথিবীতে সন্ধান করি সেই আনন্দেরই প্রসারণ। তবে জাগতিক আনন্দের চেয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বা মনের উন্নত অবস্থা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

স্বর্গ থেকে ঐশী ধর্ম এসে আমাদেরকে পবিত্র করবে এ আশায় আমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়। অন্তরের পশুত্বকে বিসর্জন দেয়ার জন্য আমাদেরকে সদগুণাবলী অনুশীলন করতে হবে। মানসিক স্বভাবের উন্মেষ ঘটিয়ে আমরা স্বর্গীয় প্রকৃতি বা উন্নত জীবনধারা লাভ করি। এটা ক্রম উন্নয়ন। স্বর্গীয় প্রকৃতি হল উন্নত জীবনধারা। সব সময় স্বাভাবিক মানবীয় আচরণ নিশ্চিত নয় এবং পূর্ব সংকেতযোগ্যও নয়, তাই অন্যদের বিশ্বাস করা কষ্টকর। আমরা অন্যান্য প্রাণী, শয়তান বা ভূত প্রেতের চেয়ে মানুষের কারণেই প্রায় প্রতিদিন অনেক বেশী ভয়, সন্দেহ ও উদ্বেগের অভিজ্ঞতা লাভ করি। অবিশ্বস্ত ও স্বার্থপর লোকের বিপক্ষে মানবিক প্রকৃতি অনুশীলনের জন্য ধর্ম অতীব প্রয়োজনীয়।

উন্নত চরিত্র কিভাবে গঠিত হয়? বুদ্ধ বলেছেন মনের চার প্রকার অবস্থাকে উন্নীত করতে হবে– মেত্তা, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। উচ্চতম মানসিক অর্জনের জন্য এই চারটিগুণ অবশ্যই থাকতে হবে। সোজা কথায় কোন ভেদাভেদ না করে সকলের প্রতি নির্বিচারে মঙ্গল কামনা ও কুশলচিন্তা অনুশীলন করতে হবে।

বৌদ্ধধর্ম মৈত্রী (মঙ্গল কামনা), খ্রীষ্টান ধর্ম ভালবাসা, ইসলাম ধর্ম সৌভ্রাতৃত্ব, হিন্দু ধর্ম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একাত্মতা শিক্ষা দেয়। অনেকের মধ্যে এসব গুণ বর্তমান কিন্তু তারা এসব নিজেদের জন্য, বলতে গেলে, নিজের সমাজ বা সম্প্রদায়ের নামে সংরক্ষণ করে। তারা মৈত্রী বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব নিজেদের ধর্মের অনুসারী বা নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রসারিত করে, অন্যদের প্রতি নয়। মৈত্রী ও করুণা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বুদ্ধ এভাবে শিক্ষা দেন নি। তিনি বলেছেন আমরা অবশ্যই দূরের বা কাছের কারো প্রতি ভেদাভেদ না রেখে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী, করুণা ও সহানুভূতি প্রদর্শন ও প্রসার করব। তিনি বলেছেন, একমাত্র সন্তানের জন্য মায়ের অন্তরে যে অনুভূতি থাকে, ঠিক তেমনি প্রতিটি জীবনের জন্য আমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে ভালবাসায় পূর্ণ একটি অন্তরের বিকাশ ঘটাতে হবে।

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

অনেক লোক আছেন যারা নিজেদেরকে মুক্ত চিন্তাবিদ বলে দাবী করেন কারণ তারা নিজেদের জন্য কোন ধর্মকেই নির্বাচন করতে চান না। তারা নিজেদের অস্তিত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও কোন মতামত পোষণ করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানান, শুধু তা নয় এতে তারা গর্বও অনুভব করেন। এটাকে মোটেই সুস্থ অবস্থা বলে গণ্য করা যায় না। অবশ্য নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রত্যেক লোকেরই নিজের ধর্ম বাছাই করার অধিকার আছে। এর জন্যে তাকে গভীরভাবে চিন্তা করে অনুসন্ধান করতে হবে। তবু অন্য ধর্মের কোন বিষয় বুঝতে না পারলে বা কোন বিষয়ে একমত হতে না পারলে সেই ধর্মের নিন্দা করা কিছুতেই উচিত নয়। তবু কারো ধর্মহীন অবস্থায় থাকা উচিত নয়। তাকে তার উপযোগী ধর্ম খুঁজে নিতে হবে কেননা পৃথিবীতে যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবসম্মত ধর্ম আছে এবং জ্ঞানী লোকেরা তা গ্রহণ করেছেন। ধর্মহীন ব্যক্তিকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরে বিচ্ছিন্ন এক ক্ষুদ্র তরীর সাথে তুলনা করা যায়।

জীবনের স্বার্থকতা ও উদ্দেশ্য এবং মুক্তি সবই ধর্মের উপর নির্ভরশীল। যুক্তিনির্ভর ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ একজন মার্জিত ব্যক্তি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করতে পারে এবং পরিশেষে জীবনের

লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। ধনদৌলত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, নাম, শক্তি ও অন্যান্য সাজসজ্জা মানুষের মনে শান্তি এনে দিতে পারে না। ধর্মহীন মানুষের মনে সবসময় একটা অভাববোধ থাকে বিশেষ করে জীবনের শেষ অধ্যায়ে এ অভাববোধ আরো বেশী প্রকটরূপে অনুভূত হয়। ধর্ম তাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একমাত্র বন্ধুর মত তৃপ্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারে।

তথাকথিত মুক্তচিন্তাবিদগণ যদি সত্যিকার অর্থে স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন তবে তারা তাদের এই মুক্ত মনোভাব জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও রক্ষা করতে পারেন। তারা কেন শুধু ধর্মের ব্যাপারে মুক্তচিন্তাবিদ বলে জাহির করতে চান?

কেউ কেউ মনে করেন কোন ধর্মের অনুসারী না হয়েও তারা যদি শিক্ষিত মার্জিত মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করতে পারেন তবে তাদের জন্য কোন ধর্মের প্রয়োজন নেই। তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে ধর্মই মানবজাতিকে সংস্কৃতিবান হিসেবে বেঁচে থাকতে শিখিয়েছে। যা হোক, ধর্ম শুধু ধার্মিকতার মার্কা লাগানোকে বুঝায় না, এর অর্থ ধর্মীয় নীতিমালা। সদজীবন যাপনের এমন কোন নীতিমালা নেই যা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত। তাই মানুষ ধর্মকে কখনো ভুলে থাকতে পারে না। একমাত্র ধর্মই মানুষকে স্বার্থপর বস্তুতান্ত্রিকতা থেকে ফিরিয়ে এনে নিস্বার্থ ত্যাগের ও মানবতার সেবার পথে পরিচালিত করতে পারে। মানব ব্যক্তিত্বের আন্তর প্রেরণার মধ্যেই ধর্মীয় নির্দেশাবলীর সুফল নিহিত।

ধর্ম ও সংস্কৃতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। ধর্মীয় আচরণ ও বিশ্বাস মানুষের মনে যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গভীরভাবে গ্রথিত হয় মানুষ তখন ধর্ম ভুলে যায় কিন্তু তাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে এসব আচরণ পদ্ধতির অনুশীলন অব্যাহত রাখে।

ধর্ম সম্বন্ধে ভুল ধারণা

প্রায়ই বলা হয় যে ধর্ম যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি। এটা বলাই বরং ঠিক যে অনেক ধর্মানুসারী ধর্মের নীতি সত্যিকারভাবে অনুশীলন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমন কি কোন কোন সময় তথাকথিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিবেকের সামান্যতম অনুশোচনার তোয়াক্কা না করে ঈশ্বর অনুমোদিত এই যুক্তিতে পবিত্র ধর্মযুদ্ধের নামে হত্যাযজ্ঞের জন্য উৎসাহিত করেন।

যুদ্ধ যুদ্ধই, তা দেশ বা জাতি, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য এবং ভাষা বা ধর্মের নামে যেভাবেই সংঘটিত হোক না কেন। ধর্মের নামে যুদ্ধ করা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক কাজ। কারণ হত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য এবং সকল জীবনের পবিত্রতা রক্ষার শিক্ষাই আমরা ধর্ম থেকে পেয়ে থাকি।

ধর্মের নামে কিছু অনভিজ্ঞ লোক ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত কিছু আচার-আচরণ পালন করে থাকে, শুধুমাত্র সেসব আচার অনুষ্ঠান দেখে কোন একটি ধর্মের দোষগুণ বিচার করা উচিত নয়। মহান শিক্ষকদের মৌলিক শিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত।

ধর্মের সাথে সম্পৃক্তহীন কোন আচরণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে না। যারা কোন ধর্ম মানেন না বলে দাবী করেন তারাও নিজেদের অজ্ঞাতে কোন না কোন ধর্মের কিছু কিছু ধর্মীয় নীতি অবশ্যই পালন করেন।

মানবতাকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য কোন ধর্ম প্রবর্তিত হয়নি। মানুষকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রত্যেক ধর্ম প্রবর্তক কিছু সুনির্দিষ্ট সত্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই মহান শিক্ষকদের অনুসারিবৃন্দ তাদের গুরুর বাণীসমূহ প্রবর্তনের জন্য তাদের নিজস্ব কিছু আপত্তিকর পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তাই কোন ধর্ম বাস্তবানুগ বলে যদি কেউ মনে করেন সেই বিশেষ ধর্ম নির্বাচনের ভার তার উপরই নির্ভর করবে, তিনিই তাঁর পছন্দমত ধর্ম নির্বাচন করবেন।

মানুষ যদি প্রকৃত ধর্ম সত্যই বুঝতে পারেন এবং অনুশীলন করেন তবে ধর্ম কখনও বস্তু জগতের উন্নতির অন্তরায় হতে পারে না। ধর্ম কিন্তু সুখের অন্বেষায় মিথ্যা মরীচিকাময় জাগতিক প্রমোদের পেছনে দৌড়ানোর জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে না।

আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে ধর্মের নামে অনেক গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং এ যুগেও ধর্মের ছদ্মাবরণে অন্ধ-গোঁড়ামি মানবতার বিরুদ্ধে জঘণ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য মানুষকে উত্তেজিত করতে পারে।

ধর্মের জন্য সময় বরাদ্ধ

অনেকে বলতে পারেন ধর্ম নিয়ে কালক্ষেপনের সময় তাদের নেই কারণ তাদের অন্য আরো সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ

কাজ আছে। নিম্নোক্ত বক্তব্যে এর জবাব মিলবে ঃ জুতো খুলে পথ ভ্রমণে যাত্রা করার ন্যায় এ যেন সমাজের কাজে যোগ দেয়ার আগে ধর্ম ত্যাগ করা।

সমাজের কাজে সর্বক্ষণ ব্যস্ততার মধ্যে যিনি নিজের ধর্মকে পর্যন্ত ভুলে যান, তিনি অবশ্য ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তাই ধর্ম থেকে তার আরো বেশী শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন।

ধর্ম অনুশীলনের জন্য জগতসংসার ত্যাগ করার দরকার নেই। আধুনিক জগতে প্রত্যেক নরনারী নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে জীবনের কর্তব্য থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কোন অর্থ হয় না। আমরা কাজের জন্যই বেঁচে আছি, সাহসের সাথে কাজের মুখোমুখি হয়ে কারো কোন ক্ষতি না করে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

ধর্মের নামে অনেকে আঁতকে উঠেন। এর কারণ সাধারণত কোন কোন মিশনারীর আপত্তিকর পদ্ধতিতে ধর্ম প্রচার। এসব প্রচার কাজ তারা এমন আপত্তিকর ও আক্রমণাত্মক উপায়ে এবং এমনই বেমানান জেদের সাথে পরিচালিত করেন যা একটা সামাজিক উৎপাতে পরিণত হয়।

আবার অনেকে মনে করেন তাঁরা, একমাত্র তাঁরাই চূড়ান্ত সত্য ও মোক্ষ ধর্মের অধিকারী। তারা অন্য ধর্মকে মোটেই সহ্য করেন না। এ ধরনের ভিত্তিহীন ধর্ম বিশ্বাসের নামে বিস্তর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আসলে এই অসহিষ্ণুতার উল্লাস ধর্মের গোঁড়ামিকে আড়াল করা ছাড়া কিছুই নয় কেননা সুযুক্তির সমালোচনার আলোকে তা টিকে থাকতে পারে না।

'এ জগতে কেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করি, এ সমস্যার যথাযথ সমাধান কোন কোন ধর্ম দিয়ে যায়নি। কোন কোন বিষয়ের উপর আমাদেরকে বিশ্বাস রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা অ মেনে নিতে পারি না। যে ধর্ম আমাদের সমস্যাবলীর যথাযথ সমাধান দিতে পারবে সেই ধর্মই আমরা নির্বাচন করতে চাই। ধর্ম অন্ধবিশ্বাস নয়।

ধর্মের আভরণে কোন কোন সময় অধর্ম প্রচারিত হয়। অনেকে মনে করেন ধর্ম মন্দির বা গীর্জার এবং পুরোহিতের বিষয়, এটা কোন গৃহীর বা ঘরে চর্চার বিষয় নয়। আবার অনেকে মনে করেন ধর্ম ছোটদের নয় বড়দের, পুরুষদের নয় মেয়েদের, ধনীদের নয় গরীবদের উপযোগী।

প্রস্ফুটিত কুসুমদলে দেখা যায় না। এ ধরণের চিন্তাধারার জন্য ধর্মের প্রতি তাদের অবহেলা ও অলসতাই দায়ী।

আজকাল অনেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলে থাকেন, কিন্তু পৃথিবীর সারাদেশব্যাপী জরিপে দেখা যায় প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রায় কোন দেশেই অনুশীলন করা হয় না। প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র নিজের ধর্ম অনুশীলন করার স্বাধীনতা বোঝায় না- নিজের প্রত্যয় অনুযায়ী যে কোন ধর্ম নির্বাচন করে তা পালন করার স্বাধীনতাও থাকতে হবে। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অতি কম সংখ্যক লোকই এই স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাদের পথে অনেক বাধা, প্রতিটি স্বার্থ থেকে আসে হুমকি।

নিজের ধর্মের শিক্ষার সাথে কেউ একমত হতে না পারলে অন্য যে কোন ধর্ম নির্বাচন করার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই তার থাকতে হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার এই মনোভাবের প্রতি যারা বাধা সৃষ্টি করবে তারা প্রকৃত অর্থে মানুষের স্বাধীন নির্বাচনের ক্ষমতা হরণ করে এবং তারা এভাবে মানুষের অন্তঃশান্তির বিঘ্ন ঘটায়।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের দ্বারা মানুষের মর্যাদা, শিক্ষা ও মানবীয় বুদ্ধির ক্ষতি বা অসম্মান করা উচিত নয়।

পরম শ্রদ্ধেয় ড. কে. শ্রী ধম্মানন্দ নায়ক মহাথের জে.এস.এম., পি.এইচ.ডি., ডি.লিট. ১৯৩০ এর জুন মাসে মাত্র ১২ বছর বয়সে দক্ষিণ শ্রীলংকায় তাঁর জন্মস্থান কিরিন্ডি গ্রামে শ্রামণ হিসাবে দীক্ষা লাভ করেন। ভারতে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শেষে ১৯৫২ এ কুয়ালালামপুর মহাবিহারে থাকার আমন্ত্রণ পাওয়া পর্যন্ত তিনি ধর্ম প্রসারের কাজে সেখানে অবস্থান করেন।

ড. কে শ্রী ধম্মানন্দ নায়ক মহাথর

তখন থেকে তিনি প্রধানত তাঁর মূল্যবান লেখনীর মাধ্যমে শুধু মালয়শিয়ায় নয়, পৃথিবীর সকল দেশে বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতির জন্য অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি মালয়শিয়ার অন্যান্য ধর্মানুসারীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছা বৃদ্ধির জন্যও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর কাজের অসামান্য সাফল্যের জন্য তিনি শুধু তাঁর দেশ শ্রীলংকা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ও বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেন।
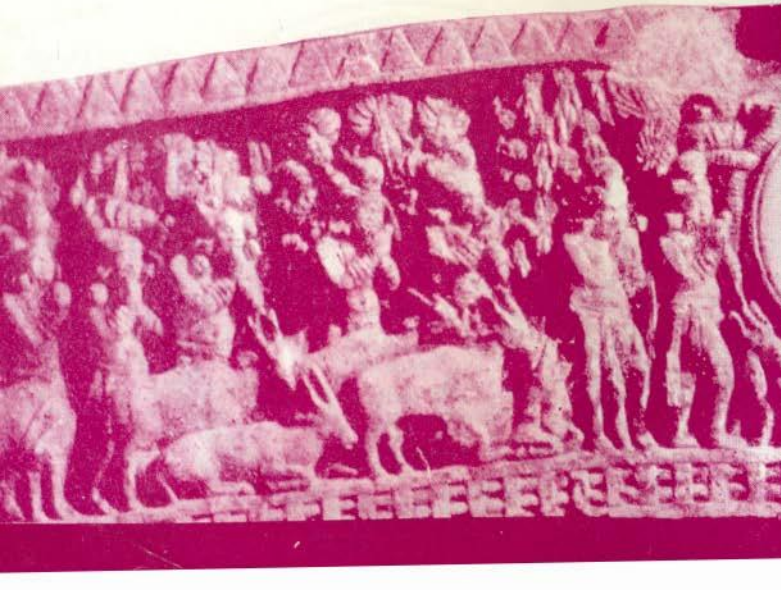
- ০ -